আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও মহাশ্বেতা দেবীর কথোপকথন

‘সবটা নিয়ে বাংলাদেশের যে সমাজ তা ঠিকই উঠে আসবে, কিন্তু সময় লাগবে...’

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। তাঁর অক্ষয় কীর্তি অনেকগুলো ছোটগল্প ছাড়াও দুটো উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা। এই খোয়াবনামা লেখা তিনি শেষ করেন ১৯৯৬ সালে, আর সেবছরই ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। ক্যান্সার চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাঁর ডান পা কেটে ফেলে দিতে হয়। এরপর তিনি লেখালেখি ও শিক্ষকতার জগতে ফিরে আসার চেষ্টা করেন। কিন্ত বছরের শেষ দিকে পরিস্থিতির অবনতি হয়। এসময় ঢাকায় সফর করেন ভারতের খ্যাতিমান কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবী। বেশ কয়েকদিন মহাশ্বেতা ইলিয়াসের বাসায় আসেন, দীর্ঘসময় কথা বলেন, গান করেন। এক পর্যায়ে ইলিয়াস মহাশ্বেতা দেবীর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার নেবার আয়োজন করেন। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইলিয়াসের আজিমপুরের বাসভবনে এই আড্ডা হয়। এর কিছুদিন পরই, ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ভোরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। রেকর্ডকৃত এই কথোপকথন থেকে অনুলিখন করেছেন তাসলিমা আখতার।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (আ. ই.): ঢাকার তৃণমূল নামে একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট লেখিকা শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবীর একটি ছোট্ট সাক্ষাৎকার গ্রহণ করব। আমি আখতারুজ্জামান ইলিয়াস পরম সৌভাগ্যবান, সাক্ষাৎকার গ্রহণের মূল দায়িত্বটি আমার ওপরই দেওয়া হয়েছে। একটি সাক্ষাৎকার মানে এক দিনের কথা নয়। যখন মহাশ্বেতা দেবী কথা বলবেন তখন কোনো কোনো কথায় তাঁকে যথেষ্ট সময় দিয়ে, অস্বস্তির মধ্যে না ফেলে, অথবা ফেলতেও হতে পারে–কিছু কিছু প্রশ্ন এখান থেকে যাঁরা আছেন তাঁরা করবেন। এখানে আছেন আমাদের কাজী ইকবাল, নাইম হাসান, গৌরাঙ্গ মণ্ডল। আমি আশা করছি, আরো অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। তো মহাশ্বেতাদি, আমরা প্রশ্ন, আলোচনা শুরু করতে পারি?

মহাশ্বেতা দেবী (ম. দে.): নিশ্চয়ই।

আ. ই.: আপনাকে কিন্তু আমি অন্তত জানি বহুকাল থেকে আপনার অন্য ধরনের উপন্যাসের জন্য। যেমন–‘যমুনা গীতি’–এসব উপন্যাসের জন্য। তো তারপর কিছুদিন পরই, বেশ কিছুদিন পরে আপনাকে আমরা নতুনভাবে লাভ করলাম। আপনাকে আমরা প্রথম পেলাম, যিনি আদিবাসীদের নিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাস বাংলা ভাষায় লিখেছেন। আপনি যাদের কথা লিখছেন, যে বীরদের কথা, তাদের কথা বিক্ষিপ্তভাবে আমরা কোথাও কোথাও পড়েছি, এমনকি আনন্দবাজার পত্রিকার খুব পুরনো সংখ্যায় রেজাউল করিম, যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ছিলেন, তাঁরও কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর লেখা ছিল। আর অন্যদের তো ছিলই। কিন্তু সাঁওতালদের নিয়ে কিংবা আদিবাসীদের নিয়ে সম্পূর্ণ উপন্যাস লেখা একেবারেই আলাদা কথা। কারণ আমরা যেটুকু জানি, আমিও একটু একটু উপন্যাস লেখার চেষ্টা করি, উপন্যাসে কিন্তু দিদি ফাঁকি দেওয়া যায় না।

ম. দে.: নাহ্, দেওয়া যায় না।

আ. ই.: এখানে আমি একটি অপ্রিয় কথা বলব কি?

ম. দে.: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আ. ই.: যেমন ধরুন, আমাদের কবি বলেছেন ‘জীবন দেবতা’, তারপর ‘সীমার মাঝে অসীম’, আছে না এসব? এসবের পেছনে নিশ্চয়ই কারো কোনো উপলব্ধি আছে, তাই না? কিন্তু উপন্যাসে এসব কোনো প্রসঙ্গ আসেনি। আমরা কিন্তু উপন্যাসে আধ্যাত্মিক সংকটও দেখেছি। যেমন–জার্মান ঔপন্যাসিক হারমান হেসের মধ্যে দেখেছি, কাজানজাকিসের উপন্যাসে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা আধ্যাত্মিক সংকট লক্ষ করিনি। তার মানে বোঝা যায়, জিনিসটার বোধ হয় আরো ভেতরে যাওয়া উচিত ছিল। মহাশ্বেতা দেবী যেটা করেছেন, যে সমস্যাগুলো নিয়ে এসেছেন উপন্যাসে, সেগুলো তিনি একেবারে ভেতর থেকে অনুভব করে, দেখে, তারপর লিখেছেন। এখন আমার যেটা কথা সেটা হলো, আপনার ওদের নিয়ে লিখে, আপনি ওঁদের আমাদের সঙ্গে যেভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, এমনকি আমাদের কারো কারো মনে একটু অপরাধবোধেরও সৃষ্টি করেছেন; আমাদের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছেন, আমাদের মধ্যে কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এগুলো আমি মনে করি, আপনার সবচেয়ে বড় Acheivment যে আমাদের উপন্যাসের তৃপ্তি না দিয়ে আপনি আমাদের খোঁচা দিয়েছেন। এবং সেই খোঁচাটা আমরা এখন একটু একটু করে ভোগ করছি। কিন্তু আমাদের চামড়াটা একটু বেশি মোটা তো (হাসি), সে জন্য সেই খোঁচা বোধ করতে দেরি হয়। এগুলো আপনার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি উপন্যাসে লেখা? আপনি তাদের মধ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন কেন? আমি Simple প্রশ্ন করছি, আমি কিন্তু Challenge করছি না।

ম. দে.: না না, ঠিকই আছে।

আ. ই.: Just জানা আর কি।

ম. দে.: আমি যখন উপন্যাস লিখেছিলাম, সে মজার ব্যাপার আছে, তাহলে জীবনের অনেক কথা বলতে হয়।

আ. ই.: হ্যাঁ বলুন। আমাদের অনেক সময় আছে।

ম. দে.: Actually আমি, আরেকটু পেছনে ফিরে যাই?

আ. ই.: হ্যাঁ হ্যাঁ।

ম. দে.: আমার বিয়ে হয় কুড়ি পরে একুশে, দ্বিজেন ভট্টাচার্য্যের সাথে। গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা Founder, Actor, নাট্যকার, গীতিকার, গায়ক। তখন, তার আগে ১৮ বছর বয়সে আসে ৫০ এর মহা মন্বন্তর...

(আ. ই.: আমাদের মধ্যে এখন এসে পড়েছেন জনাব বদরুদ্দীন উমর। তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।)

৫০ এর মহা মন্বন্তর আসে। তখনই আমি যেটুকু দুর্ভিক্ষের জন্য কাজ করি, তার ফলে আমার কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালিত আন্দোলনের সাথে সেটুকু যোগাযোগ হয়। তারপর জীবনের বেশ কিছু পর্ব অন্যভাবে যায়। এখন ৬০ থেকে শুরু হয় কি ৬২ থেকে, তারপর ৭৫ সাল পর্যন্ত–যে কারণেই হোক, আমি পালামৌ জেলায় বারবার যাই। এবং Incidentally জানতে পারি, ঘটনাবলির মধ্যে দিয়ে যা

দেখতাম, Bonded Labour System-এর কথা জানতে পারি এবং তখন আমার আগ্রহ Bonded Labour-এ। তার Statistics গ্রহণ করা, তারপর নানা রকম হেনতেন–এসব করতে করতে গ্রামে গ্রামে ঘোরা; প্রায় পালামৌ জেলাই পায়ে হেঁটে ঘোরা হয়ে গেল। তার লড়াই অন্যদিকে লিখেটিখে সেসব অন্যভাবে চলল। সেই সময় আমি রাঁচী, মুণ্ডা, বিরসা, ওরাং–ওদের খুব কাছ থেকে দেখি। এবং ফিরে আসার পর কোনো একটা সময় '৬৬/৬৭ সালে, শান্তি চৌধুরী মারা গেছেন, ছবি করতেন, উনি বললেন যে বিরসার ওপর একটা Documentary করবেন বলে, সুরেস সিংয়ের Duster and Hangingটা আমাকে পড়তে দিলেন। কুমার সুরেস সিংয়ের এই বইটা, পরে আমার অনুরোধে Oxford University Press এটাকে অনেক Revise করেটরে Birsa Munda and His Rebellion নামে ছাপাল। তখন দেখি, সুরেশ যেসব গানটান ব্যবহার করেছেন, এসব আমি অনেক দিন আগে থেকেই সংগ্রহ করছি। করতে করতে করতে আবার বিরসা Country-তে ফিরে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রাঁচীর মুণ্ডাদের সঙ্গে আমার অত, আমি তাদের সঙ্গে জীবনে জীবন যোগ করা যতটা না হয়েছে... আমি একটা Bonded Labour অনুসন্ধান করছি। মুণ্ডার মধ্যে Bonded Labour হয় না। ওঁরাওদের মধ্যে যাচ্ছি, ওদের মধ্যে Bonded Labour হয় না। অন্যান্য জায়গায় হয়, তা এইভাবে একটা গুরুত্ব না থাকলে আমি বিরসা মুণ্ডা লিখতে পারতাম না, লেখা প্রয়োজন মনে হয়েছিল।

সমস্ত বঞ্চনাটা দেখেছিলাম, সব কিছুই দেখেছিলাম আর অরণ্যের অধিকার লিখে মনে হলো, এটা সম্পূর্ণ হলো না। ওটাকে Caste and Class না বলে আমি বলব Tribe and Caste অবশ্যই Class; একসঙ্গে মিলিয়ে একটা জায়গায় আনা। যা হচ্ছিল, যা চোখে দেখেছিলাম, সেইটা আনার জন্য চোত্তি মুণ্ডা লেখা কিন্তু ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতাটা রেখেছিলাম। কেননা বিরসা মুণ্ডার সে তীর সেটাই ধানি মুণ্ডা বহন করছিল, সেটাই চোত্তি মুণ্ডাতে দিয়ে যায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। এই লিখতে লিখতে একটা সময় আসে নকশাল আন্দোলন, এলো গেল, তারপরে আমি যখন..., তখন আমাকে সব জায়গাতেই ডাকে। আমি সিংভূমে গেছি, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রথম Stage-এ। সত্তরের দশকে গেছি। Bonded Labour-তে তো বটেই। বহু হেঁটেছি, বহু কিছু করেছি। পালামৌ সম্পর্কে এটা বলা দরকার হবে যে, এর পরে কিন্তু Bonded Labour নিয়ে প্রচুর আন্দোলন করা, তাদের সংগঠিত করা, প্রথম Bonded Labour করা; তার পরের বছর অগ্নিবেশকে ওখানে নিয়ে যাই। এবং তার আগের বছরই আমরা শহরের ভেতর যারা কোনো দিন ঢোকেনি, সেই Bonded Labour হাজার হাজার ঢুকিয়ে দিই। তারা নিজের জীবন নিয়ে নিজেরা নাটক করে দেখায়, গান্ধী ময়দানে এবং হাজার হাজার এই যে 'বন্ধুয়া প্রথা নেহি চলেগা, যো বোহেগা ওহি খায়েগা', 'যো বোহেগা ওহি কাটেগা, বন্দুয়া প্রথা বন্দ করো'–এসব বলে সেণ্টাগান দিতে দিতে ডিসি কোর্ট ঘেরাও করে ট্রাকের ওপর (ওখানে Tribe discrict, কাজেই Deputy Commissioner হয়) লাফিয়ে ওঠে, অনেক চেঁচামেচি করেটরে। তখন ওদের সংগঠন যখন গঠন করা হলো, তারপর অগ্নিবেশ সেটাকে নিখিল ভারত বন্দুয়া মোর্চার সাথে সংযুক্ত করে। তাতে খুব কাজ হয়নি। কেননা তার পরে পরে '৭৬/৭৭ পালামৌ চলে এলো, কৃষ্ণা সিংয়ের পেছনে নকশাল আন্দোলন চলে এলো। নকশাল আন্দোলন যখন চলে এলো, তখন এদের অবস্থা একটা হলো, আরেকটা মজার জিনিস হলো ডালটনগঞ্জ থেকে অমৃতসর পর্যন্ত একটা রেললাইন হয়। অর্থাৎ ওরা ঐ কাজ না করলেও পারে, ওরা অন্য জায়গায় কাজের জন্য চলে যেতে লাগল, উপরন্তু আমাদের এই মিছিল এবং এই Demonstration মিটিংয়ের পর ওরা বলল যে, এটা ঠিক হবে কি না? আমি বললাম, এটাই ঠিক হবে। ডিসিকে দিয়ে আমরা বলিয়েছিলাম, '৭৬ সালে এই প্রথা Abolish করা হয়েছে। বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, এই প্রথা তোমার এখানে এত বেশি চলে যে এখন এটা চিহ্নিত as a Bonded Labour district এবং Above Fourty Thousand এবং ও বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, ওরা যদি আর না করে তবে তোমরা Legally কিছু করতে পারো? তখন চুপ করে আছে। আমি বললাম, legally কিছু করতে পারো? বলল, না। এইটুকুন। এর ওপর ভিত্তি করে ওরা দলে দলে Bonded Labour খাটা ছেড়ে দিয়ে অসম্ভব কষ্ট করেছিল। কেউ কেউ ফিরেও গিয়েছিল। নকশাল আন্দোলন চলে আসার পরে তার চাপে, কৃষ্ণা সিংকে যদিও মেরে ফেলে, কিন্তু নকশাল আন্দোলন নানাভাবে ওখানে চলতেই থাকে। যার ফলে ওদের জঙ্গল থেকে মহুয়া নেওয়ার Right, তারপর নিজেদের জমি ধরে রাখার Right এবং কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ প্রবল হতে থাকে। কাজেই আজকের পালামৌ আর সেই পালামৌ নেই। যেটা দেখেছিলাম যে দুই মণ ধান গরমকালে বলদকে দিয়ে পাঠাবে না হাটে, একটা Bonded Labour-এর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে গরুর গাড়ির জোয়াল। বলদ মরে গেলে দুহাজার টাকা নষ্ট। একটা মানুষ মরে গেলে অত ক্ষতি নেই। সেই জোয়ালটা চাপা পড়ে তার একদিকের কাঁধ বেঁকে যায়। এইগুলোর পরে তখনো আমি হাতে-কলমে যে অত কাজ করছি তা না। কিন্তু যখন সিংভূমে ডাক পড়ল, ঝাড়খণ্ড Movement-এ গুলি Firing হলো, '৭৯-এ Firing হলো, ১১ জনের death live admit করল। Compensation দিল। কিন্তু ১১ জন মরেনি...তখন ওখানে গিয়ে Investigate করতে করতে ১৯টা নাম বের হলো। ১৯টা নাম EPW-তে ছাপিয়ে দিয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি করে তার পরে যথেষ্ট...তখনকার আন্দোলনটা অন্য রকম ছিল। মেয়েদের একটা আলাদা জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলনও ছিল। মেয়েরা প্রচুর তীর-ধনুক নিয়ে লড়ত। তারপর সারেন্ডার। ফরেস্টের ওপরে যেখানে 'কোন' বিদ্রোহ হয়েছিল, সেখানে বটগাছের ওপরে মাচান করে জিনিসপত্র রাখে, কেননা হাতি আসে। ধানটান ওখানে রাখে। ওখানে দেখি World Bank-এর Finance করা টিউবওয়েল, একটু একটু ঝাঁকালেই জল পড়ে। কোনো দিন ছিল না। আমি বললাম, এটা কী করে এখানে এলো? ওরা বলল, Firing-এর পর কিছুদিন চুপচাপ ছিল। তারপর ওরা প্রচুর করে দিয়েছে। সব জায়গাতেই আমি যেটা ওদের বলতাম, তোমাদের কী অধিকার আছে সেগুলো জানো? জলের অধিকার, বিদ্যুৎ অধিকার ওরা নিজেরাই চাইতটাইত। এরকম হেঁচড়পেঁচড় করতে করতে '৭৯-তে তো অরণ্যের অধিকার Academy পুরস্কার পেল। তখন পশ্চিম বাংলার তিনটি Tribal জেলা ঝাড়গ্রাম মহকুমা, মেদিনীপুর আর বাঁকুড়ার অনেকটা আর পুরুলিয়ার এদিকটা। হাটে-বাজারে ঢোল-ডগর দিয়ে ওরা বলল, আমরা পুরস্কার পেয়েছি। আমাদের নাম ইতিহাসে উঠে গেছে। কাজেই এখন আর হাট চলতে পারে না এবং তারা সব অনেক অনেক চিঠি Deputation আমার কাছে...কাজেই আমি এই পুরস্কারটা, আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন, আমি নিতে দিল্লি যাইনি। ওরা এসে দিয়েছিল, মুণ্ডারাও সেখানে অনেকে এসেছিল। কাজেই মুণ্ডাদের সঙ্গে যুক্ত হলাম। মুণ্ডাদের মধ্যে, আমি খেড়িয়াদের মধ্যে যে ধরনের কাজ করি, সে রকম কাজ করার ছিল না, কিন্তু ওদের সংগঠিত করা দরকার ছিল। সেটা আমি সব সময় বিশ্বাস করি, ওরা

নিজেরাই সংগঠিত হোক। Minimum কতগুলো কাজের ভিত্তিতে ওরা নিজেরাই সংগঠিত হোক। ওদেরকে Political Fource বলে মনে করা হতো। সেটা সব সময় মিথ্যাও হয়নি। তাই...মুণ্ডা গেল,...অঞ্চলের দিকে মুণ্ডা, ওঁরাও–সব আর মাঝামাঝি তো সব চলছেই। ইটভাটার শ্রমিক, সেসব Investigate করে লেখাটেখা Concrete কাজের মধ্যে আমি বেশি বলা যে Criminal Tribe-এ শব্দের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। মেদিনীপুরের লোধাদের নিয়ে, ভারতবর্ষে ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতজুড়ে যতটা Forest Tribe যত ছোট ছোট যারা Cultivation করে না, তাদের Criminal Tribe বলে ঘোষণা করে। All over India আছে। দিল্লিতে একটা খুন হলেই সানসি Tribe যেখানে থাকে, সানসি কলোনিতে, ওখান থেকে ওদের ধরে নিয়ে আসে। আর চুরি-ডাকাতি হলেই ওরা বাওলিয়া Tribe ধরে। এটা হলো দিল্লির কথা। আমার পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে আছে লোধা শবর, পুরুলিয়াতে আছে খেড়িয়া শবর। লোধাদের মধ্যে আমি অনেক দিন কাজ করি। ওদের যা কাগজে প্রতিশ্রুতি গভর্নমেন্ট যা দিচ্ছে তা দেবে না কেন? কী প্রতিশ্রুতি? গভর্নমেন্ট কী দিচ্ছে? এগুলো নিজের খরচে হাজার হাজার ছাপিয়ে প্রচার করতাম। আরেকটা জিনিস প্রচার করতাম, একটা Proforma বের করতাম–ঘর কিসের তৈরি, পরিবারের সদস্য কজন? কী আছে? কী নাই? জমি আছে নাকি নাই? জমি থাকলে সেটা কী ধরনের জমি? জমির আয় কী? না পাট্টা না বর্গা না মরুভূমির জমি? স্কুলে যায় নাকি? কোনো সাহায্য পায় নাকি হেনতেন ইত্যাদি। এগুলো করতে গ্রামবাংলার প্রকৃত ছবিটা উঠে আসতে লাগল। এবং এগুলো দিয়ে Government-কে অনেক Attack করি। আমার পত্রিকার 'লোধা সংখ্যা' করেছি, 'মুণ্ডা সংখ্যা' করেছি। তেমনি প্রয়োজনীয় 'মুসলিম সমাজ ভাবনা'ও করেছি। 'বন্ধ কলকারখানা সংখ্যা' করেছি। এ রকম অনেক সংখ্যা করেছি। 'ওঁরাও জাতি সংখ্যা' করেছি। ... ...। এই লোধাদের সঙ্গে কাজ করার সময় আমার সঙ্গে Political Friction এড়িয়ে, সরাসরি Confrontation হচ্ছে না কিন্তু লড়াই চলছে, Constant লড়াই চলছে। এ চলছেই। আর বিহারে একদিকের সিংভূমের বিহারে ইত্যাদি করতে করতে করতে করতে ওড়িশার কেউনঝড় আদিবাসী অঞ্চলে, করতে করতে যখন লুধাতে এলাম, তখন লুধারা আমাকে বলল, আমি দশ বছর কাজ করার পর আমাকে বলে, 'আপনি এলে শুনছি আপনার কিছু হবে না, কিন্তু আমাদের ওপর অত্যাচার আসবে।' আমি তখনই বুঝলাম, লোধা মেয়েরা আগে তীর-ধনুক নিয়ে লড়তটড়ত, লোধারা ভয় পেয়ে গেছে। আমি বললাম, 'আমি আর যাব না।' লোধারা আজও আমার কাছে আসে, তাদের প্রতিটি প্রয়োজনে আসে। সাধ্যমতো প্রতিকারের চেষ্টা করি। কিন্তু লোধা বেল্টে আমি আর ঢুকি না। আর লোধাদের সাঁওতালরাও মারত। Criminal Tribe, তার জন্যেই '৮৬ সালে একবার গিয়েছিলাম Tribal Unity Forum গঠন করতে। পশ্চিমবঙ্গে ৩৮টা Identified গোষ্ঠী আছে। Last কর্মক্ষেত্র দেখলাম পুরুলিয়ায় খেড়িয়া শবর। যারা লোধা থেকে সংখ্যায় কম, অন্য Tribe এর সঙ্গে থাকে না, দূরে দূরে পাহাড় ডুমরীতে থাকে, জমি নেই এবং এদের Criminal tribe বলে। যেমন–'৭৭-৭৯-এর মধ্যে মেদিনীপুরে, বামফ্রন্ট পাওয়ারে আসার পর ৩৭ জন লোধাকে গণহত্যা করা হয়, '৮২ সালে ৬ জনকে। এই ৬ জনের পর–লুকিয়ে যেতে হয়, ভেতরে ঢুকতে হয়। Investigating Report লিখতে হয়, প্রচুর লড়াই করতে হয়, ওদের নিয়ে আসতে হয় কলকাতায়। আন্দোলন হেনতেন করার পর কিছু কিছু লোধা কাজ করে। কিছু কিছু লোধা Development Cell Activated হলে ওদের পার্টি সংগঠনের মধ্যে ঢুকাচ্ছিল ইত্যাদি। খেড়িয়াদের মধ্যে যখন কাজ করতে আরম্ভ করি, একেবারে শুরুতেই করি, Registry করে। তখনই ঠিক করেছিলাম, এফসিআর নেব না, এফসিআর নিয়ে কাজ করাতে আমার খুব বিশ্বাস ও আগ্রহ ছিল না। কারণ এফসিআর Funded অনেক সংগঠন দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে। অন্যত্রও দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গেও দেখেছি, খুব একটা মনে হয়নি যে ও রকমভাবে কাজ করতে পারব–চাইনি, কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে, তখন তাদের জীবনে অনেক দিন ধরেই যুক্ত ছিলাম, আরো বেশি করে যুক্ত হতে হয়েছে। উপন্যাস লেখা এবং একই সঙ্গে লিখতেও হয়েছে। লেখার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু লেখার জন্য একটা দূরত্ব খুব সাহায্য করে। যেমন–'কৈবর্ত খণ্ড' বা 'বেনেবৌ' বা 'ব্যাধখণ্ড' ইত্যাদি লেখার সময় একটা দূরত্ব এতে কাজ করেছে।

আ. ই.: এ তো সময়ের দূরত্বই অনেক।

ম. দে.: সময়ের দূরত্ব। কিন্তু সেটা হচ্ছে ইতিহাসকে এভাবে দেখানো...চিরকালই এইটে ছিল, শোষক ও শোষিত সবটাই তার ইতিহাস।

আ. ই.: আপনি যে দূরত্বের কথা বলছেন, এটা নিশ্চয়ই ঠিক। তো শবরদের সঙ্গে আপনার যে যোগাযোগটা ঘটেছে, সেটা তো খুবই অন্তরঙ্গ, তাই না? এদের নিয়ে কি উপন্যাস লেখা সম্ভব?

ম. দে.: একেবারেই সম্ভব না।

আ. ই.: ধরুন চার-পাঁচ বছর পর?

ম. দে.: কোনো দিন যদি সেই Perspective পাই তবে, আমি গল্প লিখেছি কিছু কিছু।

আ. ই.: হ্যাঁ, গল্প লিখেছেন।

ম. দে.: কিছু কিছু গল্প লিখেছি আর এবার আমার 'বর্তিকার' সংখ্যাটাও হবে খেড়িয়া শবর সংখ্যা, কিছু Statistics...। আমি তো বিশ্বাস করি ওদের দিয়ে কথা বলানোতে। কাজেই ওদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কী কী আচার-প্রথা পালন করে, তার ভেতর থেকেই আর্ধেকটা বেরিয়ে আসে। কী বক্তব্য, কী ব্যাপার ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন কোনো দিন লিখব নাকি জানি না। তবে 'টেরোর...' নামে যে উপন্যাস লিখেছি, সেটা আমার সমস্ত Tribal অভিজ্ঞতার Abstract বলা যেতে পারে। তার মধ্যে সব Tribal Experienceটাই বলা হয়েছে। সেই Experienceটাই আমি নতুন করে...পরশু রাজশাহী থেকে বদলগাছি, পাহাড়পুর থেকে অনতিদূরে মাধবপুর গ্রামে... সেখানে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, মিজ, মাহালি–সবাই থাকে। সে অসম্ভব অবস্থা! রাস্তা থেকে দেড় মাইল দূর, তারা ধানক্ষেত থেকে মাটি তুলে মাটির রাস্তা করেছে। ঘরের দেয়াল-টেয়াল মোটামুটি পরিষ্কার, চাল একেবারে গলে পড়ছে, দুটো মজা পুকুর আছে, তাতেই তারা স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, আরেকটা Lord Clive-এর সময় ছিল না, কিন্তু ঐ ধরনেরই একটা ভারতবর্ষের একটা প্রথম টিউবওয়েল বসানো আছে। তার যেমন চেহারা, তেমন আকৃতি।

আ. ই.: বহু প্রাচীনকালের টিউবওয়েল...।

ম. দে.: প্রাচীন টিউবওয়েল রয়েছে। শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্যের কোনো ব্যবস্থা নেই, জীবিকার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে ভূমি সংস্কারের বালাই নেই; কাজেই ওরা যে বলে, অতক্ষণ আমি ছিলাম না। জমি মনে হয়, অপরের জমি চষে কিছুটা। তো কারো কারো গৃহসংলগ্ন খানিকটা থাকতে পারে। সবজিটবজি করে এই রকম। কাজেই একই রকম অবস্থা। মানে আনন্দ পাওয়ার কিছু নাই।

আ. ই.: না, আনন্দ পাওয়ার কিছু নাই।

ম. দে.: তবে লেখার প্রয়োজন আছে। ইতিহাসে এদের স্থাপন করার জন্য, যেটা মুণ্ডাদের বেলায় হয়েছিল। আর সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে দুটো উপন্যাস 'শালগিরার ডাকে', যেটা বাবা তিলকামাঝির ১৭৮৫ থেকে ১৭৯০ সালের উপন্যাস, সেটাতে আছে সিধুকানুর ডাকে। কিন্তু ক্রমশই যেটা মনে হচ্ছে, সেদিনও বোধ হয় আলোচনা করছিলাম...উমর সাহেব রয়েছেন, এই যে আদিবাসী বিদ্রোহগুলো হয়েছে, সশস্ত্র বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সেগুলো ইতিহাসের কোথাও স্বাধীনতার লড়াই হিসেবে স্থান পায়নি। তাদের একটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। আর তাদের যে বিতাড়িত করা হয় বিদ্রোহের পরে Eviction, তার পরে তাদের 18th Century-তে Bengal Presidency-তে আনা হয়। আসামেও নেওয়া হয়। ঐ জঙ্গল হাসিল করো, চা বাগানের জন্য জমি বানাও। জঙ্গল হাসিল করো, কৃষিভূমি বাড়াও। Plantation-এ নিয়ে যাওয়া। এবং জঙ্গল হাসিল করাকালীন অবস্থায় বলা হতো, তোমাদের যতটা পারবে নিজেরা জমি ভোগ করো। একেকটা সময় ছিল, পুরনো Document -এ পাওয়া যায়, এই ৮০ বছর আগে একেকজন ৮০ বিঘা ১০০ বিঘা করে জমি ভোগদখল করেছে। এই যে নকশালবাড়ি জায়গা, ওখানেও তা-ই ছিল। কিন্তু চা বাগানে সব চলে গেল। তেভাগা আন্দোলনের মূলে ছিল যা, তা যেমন আমরা জানি, ঐ বহু জায়গায় যেমন বলেছিলাম, Extreme জায়গায় নিয়ে গেছে, তেভাগা আন্দোলনের সময় তো অনেকগুলো জিনিস মিলেছিল। যারা তেভাগা করছে, বর্গাচাষি পাবে তাদের সঙ্গে। ক্ষেতমজুরদের কিছুই পাওয়ার কথা না। বহু ক্ষেতমজুর শামিল হয়েছিল। আর এই যে চা বাগানের হাসিল করা আদিবাসীরা, তারাও সব শামিল হয়েছিল।

আ. ই.: তেভাগা হলে তো ক্ষেতমজুরদের কিছু হতো না। ক্ষেতমজুররাও শামিল হয়েছিল কেন?

ম. দে.: হয়েছিল কারণ এটা একটা শ্রেণির লড়াই। তারা সঙ্গে এসেছিল, এটা হতেই হতো। সে জন্যই স্বাভাবিক (আ. ই.: হ্যাঁ, এটাই...) ভাবেই শ্রেণিবিভাজন ছাড়া তো সমাজ নয়। নকশাল আন্দোলনের মূলে একেবারে নকশালবাড়ি অঞ্চলটা, যা ওদের জমির লড়াই। জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তার লড়াই।

আ. ই.: তাহলে নকশাল আন্দোলনকে কি তেভাগা আন্দোলনের Continuation বলতে চান আপনি?

ম. দে.: আমি বলছি Continuation, যতগুলো কৃষক অভ্যুত্থান এ ধরনের বিদ্রোহ পরস্পরের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে গ্রথিত। আরো অনেক আছে। সব নাম করে লাভ নেই। কাজেই আমার অত দূরে না গিয়ে, তেভাগা থেকে নকশাল আন্দোলন এবং তারপর...এ রকম বড় একটা গ্রথিত করে উপন্যাস লেখা...।

বদরুদ্দীন উমর (ব. উ.): এটা তো আমার সাথে একবার কলকাতাতে কথা হয়েছিল যে একটা এ ধরনের লিখবেন। সেটা আরো ১০-১২ বছর আগে।

ম. দে.: হ্যাঁ, হয়েছিলো। সেটাই আমি বলব। বহুদিন ধরে কোনো সময় পাই না। এই সমিতির চাপ আছে। '৯৫-৯৬ সালে আমি কোনো টেবিলে বসতে পারিনি।

আ. ই.: না, উমর ভাই যেটা বললেন, যে কত, ১০-১২ বছর আগে, না? ঠিক আছে আপনি না হয় আরো ১০-১২ বছর সময় নিন। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়, আপনি যেটা বলছেন যে কিছু দূরত্বের দরকার, ঠিক আছে। দূরত্বটা দরকার। দূরত্বটা যে সব সময় একেবারে শারীরিকভাবে হতে হবে তা না (ম. দে.: না না)। আপনি একজন লোকের সাথে মিশতে মিশতেও কিন্তু তাঁকে, তাঁর সম্পর্কে বোঝা সম্ভব, তাই না?

ম. দে.: আমি শারীরিক বলছি না, আমি মানসিক দূরত্ব বলছি। মানসিক দূরত্বটা কেমন, ওরা যতটা স্বাবলম্বী হচ্ছে, ততটা যা হচ্ছে না? আমার হয়তো অতটা ওদের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না, ওরা নিজেরাই যদি থানা ঘেরাও করে, আর পুলিশকে মরাইল দেব বলে, তাহলে আমার অতটা দরকার পড়ছে না।

আ. ই.: আচ্ছা, এই গল্পটা আপনি আগেই করবেন না, কারণ এ গল্পটা আমরা শুনব। পুলিশের গল্পটা আর কি। না, শোনা হচ্ছে না যেটা, যেটা আপনি বললেন, আমারও মনে হয়, ধরেন আরো দু-চার বছর পরে, তখন আমার মনে হয় ওদের সাথে মিশেও লেখা সম্ভব।

ম. দে.: হয়তো পারব।

আ. ই.: কারণ যারা মধ্যবিত্ত নিয়ে লেখে, মধ্যবিত্ত নিয়ে যারা উপন্যাস লেখি, তারা যে সব সময় খারাপ লিখছে তা তো না। তারা তো ভেতর থেকেই লিখছে, তাই না?

ম. দে.: সে তো নিশ্চয়ই।

মুফাদ : দূরত্বটা Essential কেন?

আ. ই.: Essential তো বটেই।

ম. দে.: আমাদের তো একেকজন লেখকের Process একেক রকম।

আ. ই.: না না, ঔপন্যাসিকদের অবশ্যই দূরত্ব প্রয়োজন।

ম. দে.: আর আমার ব্যক্তিজীবন, সে রকম আমি বহু বছর আগেই, বলা যেতে পারে, ১৯৬০ থেকে আমি মনের ভেতরের মনের চারদিকে একটা Immunity Wall করে রেখেছি, যার ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেইনি। কোনো ঘটনাতেই ঢুকতে দেইনি। তাহলে আমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাব। এটা রেখেই কিন্তু আমি সব কাজ করে গেছি। এটার মধ্যে থেকেই লিখতে হবে।

আ. ই.: আচ্ছা দিদি, শোনেন, আপনার উপন্যাস পড়ে, লেখা পড়ে আমার মনে হয়, আপনি যে শবরদের সাথে কাজ করছেন, এটা নিশ্চয়ই শবরদের জন্যই করছেন।

ম. দে.: হ্যাঁ।

আ. ই.: কিন্তু যদি আমি বলি যে আপনি মধ্যবিত্ত যে পরিবেশ, সেখান থেকে খানিকটা মুক্তির জন্য ওখানে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা কি ঠিক হবে?

ম. দে.: নাহ্! আমি তো এদের মধ্যে অনেক দিন আগেই চলে গেছি। সেটা শবর ছিল না, অন্য কেউ ছিল।

আ. ই.: অন্য কেউ ছিল।

ম. দে.: অন্য কেউ ছিল।

আ. ই.: আচ্ছা, যেখানেই যান আর কি।

ম. দে.: আর ক্রমশই দেখছি আমি, অনেক টাকা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবা না রাজনীতি এক দিক থেকে মানুষকে ফেল করেছে। পশ্চিমবঙ্গে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই। আন্দোলনের ক্ষেত্র আছে, আন্দোলন নেই। এখন যাদের, মধ্যবিত্ত গিয়েই যদি আন্দোলন করে, তারা করবে হয়তো, একদিন সরে আসবে, আমরা বারবার যা দেখলাম। নাম বলব না, তেভাগার একজন, তখনকার দিনের কৃতী একজন নেতা, তাঁর কাছে যখন তেভাগার জন্য, তেভাগার জন্য বিশেষ Interview নিতে যাওয়া হলো, তিনি এখন দিল্লিতে থাকেন, প্রত্যেকটা দ্বিতীয় শব্দ হলো ইংরেজি চোস্ত ইংরেজি। উনি যে একসময় এসব জায়গায় কৃষিক্ষেত্রে ছিলেন, তাদের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন...সমস্তটাই ইংরেজি। কাজেই কিছু করার নেই। এই দিয়ে তো হবে বলে মনে হয় না। এখন দূরত্ব কথা নয়। লিখব, লেখার প্রয়োজন আছে। আর মধ্যবিত্ত জীবন যদি বলো, আমার নিজের দেখে

দেখে দেখে আমার আশপাশে দেখেছি, লেখকদের যে পরিণাম দেখেছি, তাতে আমি নিজে একটা পথ বেছে নিয়েছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। এবং একটা দিক দেখেছি অনেকে প্রয়োজন অনুভব করেছেন, এর পরে এঁদের নিয়ে লেখা উচিত। অনেকে ভালোও লিখেছেন। সাধন চট্টোপাধ্যায় বলো, অভিজিৎ সেন তো বটেই, জয়ন্ত জোয়ার্দ্দার একসময়, সৈকত–এ রকম বহুজন বহু সময় চেষ্টা করছেন, চেষ্টা করে চলেছেন, নানাভাবে করে চলেছেন যদি কিছু হয় ভালো, নিজেরা লিখতে শিখে যত দিন না ওরা তত দিনে। এর বাইরেও সাহিত্যের কথা তো থাকেই–তার শৈলী, তার উপস্থাপনা, তার জন্য অসম্ভব পরিশ্রম করা। একেকটা Period নিয়ে লিখতে গেলে 11th Century বা 15th Century তখন তার মধ্যে ফিরে যেতে হয়। পড়াশোনা করতে হয়। চর্চা করতে হয়। এ সব তো আছেই।

আ. ই.: আপনি আমাদেরকে শবরদের কথা শোনালেন আজকে। আপনার থাকতে গিয়ে কি মনে হচ্ছে মধ্যবিত্তদের সঙ্গে ওদের প্রধান পার্থক্য?

ম. দে.: মধ্যবিত্তদের প্রতি আমার Actually কোনো বিরাগ নেই। আমি শুধু দেখছি, আমি অনেক দিন থেকেই দেখছি। বর্তিকা পত্রিকা করার সময় যেটা বলেছিলাম, আমি তো কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব পড়িনি। যেটা লিখেছিলাম, যেভাবে লেখা হয়, সেভাবে তারা কথা বলে না। ও এখানে আরেকটা Interesting সাহিত্য Point আসছে। বোধ হয় ২২ বছর আগে National Book Trust-কে আমি একটা বড় Paper দিয়েছিলাম, যে যখন থেকে বাংলা ভাষাকে ভীষণ পরিশীলিত, ভদ্রলোকের West Bengal-এর ভাষায় এভাবে লিখতে হবে, আমরা যে কথা বলছি কতগুলো ভাঙা Sentence, কতগুলো জায়গায় বাদ পড়ছে, কিভাবে কথা বলি আমরা। তারপর চাষি কামার কুমোর জেলে বা এ রকম ধরনের লোক, মানে অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যে শ্রমিকরা আছে, যারা মেহনতি মানুষ, সংগঠিত ক্ষেত্রেও যারা আছে, তারা যে কাজ করে, তাদের নিজেদের কাজের Context প্রসঙ্গে তারা সম্পূর্ণ একটা অন্য Vocabulary ব্যবহার করে। সেটা আগেও করত, এখনো তা-ই করে। নতুন করে আমরা তার কিছু আভাস পাই। এই বিশাল জীবিত জীবন্ত ভাষাটাকে সাহিত্য থেকে ব্রাত্য করে রাখা হলো। সাহিত্য মানে অত্যন্ত পরিশীলিত Grammatically Correct–এ রকম সাজানো সাজানো শব্দ। এটাও আমার ভেঙে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। এটা আমার ঠিক ঠিক মনে হয়নি। ঐ ভাষাকে তুলে আনার ইচ্ছে ছিল। মনে হয়েছে, এটার দ্বারা বাংলা সাহিত্য খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আ. ই.: এটা অবশ্য আমারও সব সময় মনে হয়।

ম. দে.: এটা ঔপন্যাসিকের কথা।

আ. ই.: এবং এটা ঔপন্যাসিকের পক্ষে...

ম. দে.: প্রাবন্ধিকের কথা না। বদরুদ্দীন উমরের লেখা যাঁরা পড়বেন, যাঁরা পড়ে বোঝেন, তাঁরা সেই মানসিকতাসম্পন্ন, সেই শিক্ষা-দীক্ষা, সেই Level-এ তার প্রয়োজন আছে। গল্প-উপন্যাসে এত সাজানো কথা, এত পেলব গদ্য, অমুক তমুক...

আ. ই.: না দিদি, গল্প-উপন্যাসে তো দরকার হয়ই, প্রবন্ধেও কিন্তু এটা দরকার হয়।

ম. পদ.: প্রবন্ধ তো সকলের কাছে যেতে পারে না...

আ. ই.: যেমন বদরুদ্দীন উমরের যে ভাষা, সে ভাষা কিন্তু অনেক বেশি প্রাঞ্জল এবং সেই ভাষা কিন্তু বদরুদ্দীন উমর যখন ধরুন কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে লিখছেন, তখন কিন্তু তাঁর ভাষা যেটা হবে, তিনি যখন মৌলবাদের বিরুদ্ধে লিখছেন তখন তাঁর ভাষার একটু পার্থক্য হবেই। বদরুদ্দীন উমরের আগে যেটা Problem ছিল, আমাদের দেশে, মানে বাংলাদেশে যে খুব সোজা কথাগুলো বেশ কঠিন করে বলা হতো, জটিল করে বলা হতো।

ম. দে.: তারপর উনি সেটা সহজ করেছেন।

আ. ই.: হ্যাঁ, এ রকম যেটা অনেক সহজ করেছেন। বিশেষ করে ষাটের দশকে বদরুদ্দীন উমরের যে ভূমিকা, সেটা আমার মনে হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আমাদের জন্য নয়, বদরুদ্দীন উমরের জন্যও।

ব. উ.: ওটা এখন থাক। আমি যে ভাষার কথা বলছি, আমি আপনাকে একটা বই দিয়েছি, আপনি সব ফেলে যাবেন না, কিছু নিয়ে যাবেন। ঐ যেটা সেদিন Office-এ দিয়েছি, তার মধ্যে 'মুক্তি কোন পথে' বলে একটি ছোট্ট বই আছে। এইটি আমি শ্রমিকদের জন্য মূলত লিখেছি এবং কৃষক অঞ্চলেও যারা কাজ করে কিংবা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং আমি ইচ্ছা করে ঐটার ভাষা অনেক চিন্তা করে এমনভাবে দিয়েছি, যাতে একদম ভেঙে...ওর চেয়ে সহজ মানে আমি তো আর পারব না।

ম. দে.: একটা বিশেষ সংখ্যা বার করে ওটা আপনার কাছ থেকে ঋণ স্বীকার করে ওটা আমি পুরো বর্তিকায় রিপ্রিন্ট করে দেব।

ব. উ.: আপনি বলছেন, ওটা আপনি দেখেছেন?

ম. দে.: আমি কোনো জিনিসই এখনো পুরো খুলে দেখার সময় পাইনি...

ব. উ.: সেটা আপনি দেখবেন, ওটাতে আমি একটা Hand Book-এর মতো করেছি, যাতে ওটা পড়ে, মানে আসল ব্যাপারটা কী, এটা যাতে যে কোনো একজন প্রথম যে এসেছে সে বোঝে।

ম. দে.: চলে যাবে, গ্রামে গ্রামে চলে যাবে। আমরা তো এগুলো করি কি, বড় বড় হরফে ছাপিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করি। আর বদরুদ্দীন উমর, আপনি বললেন না আপনার বই নিয়ে যাচ্ছি কি না? আপনি একমাত্র লেখক এ বাংলা ও বাংলার, যাঁর যত বই যখন পেয়েছি, যা আপনি দিয়েছেন, যা কিনেছি–সব বই সুসজ্জিত আছে।

আ. ই.: শুধু সুসজ্জিত থাকবে না, সুপঠিতও থাকবে (হাসি)।

ম. দে.: সেগুলো সুসজ্জিত সুপঠিত সেই জন্য সেগুলোকে সাবধান করা হয়েছে।

কাজী ইকবাল: এই কাজটি প্রথম নীহাররঞ্জনের 'ছোটদের অর্থনীতি', 'ছোটদের রাজনীতি'; এটাও কিন্তু খুব আমাদের অনুপ্রাণিত করে, আমরা যখন প্রথম প্রথম এ বইটা পড়ি।

আ. ই.: তারপর দেবীপ্রসাদ চট্টোপ্যাধায় 'জানবার কথা'...

ম. দে.: না না, সেগুলো তো ঠিকই আছে।

আ. ই.: না না, উমর সাহেবের লেখা ও রকম না কিন্তু। তুমি যেমন বলছ, তা না।

ব. উ.: আমি একটা Total জিনিসকে ধরবার চেষ্টা...

আ. ই.: হ্যাঁ, একটা Total জিনিসকে ধরবার চেষ্টা, ওটা Some sort of general knowledge...

ম. দে.: বদরুদ্দীন উমরের সমস্তটাই।

আ. ই.: না না, উমর ভাইয়েরটা তা নয়। উনি Totalityটা ধরে ফেলেছেন। ওঁকে এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উসকানি দিয়েছিলেন আসহাবউদ্দীন সাহেব। আমাদের অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ ছিলেন, উনি বারবার বলতেন যে আপনি সোজা করে লেখেন। ওনার কথা একটু কিছু বলি হ্যাঁ? উনি ছিলেন, মানে এসবের ব্যাপারে ওঁর একটা প্রাণের যোগ ছিল।

ব. উ.: জীবনের যোগ ছিল।

আ. ই.: বলা উচিত তাঁর সম্পর্কে।

ব. উ.: গ্রামাঞ্চলে মানুষের সাথে তাঁর এ রকম একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় চলছিল। তার থেকেই উনি আমাকে বলেছেন যে, দেখুন, আমি তো কমিউনিস্ট পার্টিতে দীর্ঘদিন এসেছি। অনেক বড় বড় ইয়েদেরকে বলেছি যে একটা লিখুন, তো কেউ লেখেননি এবং আমিও যে মনে করেছিলাম অনেক দিন থেকে লিখব, কিন্তু উনার প্রথম তাগাদা এবং বইটা লেখার মধ্যেও বেশ কিছু সময় গেছে। যে জন্য একবার খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উনি আমাকে একটা চিঠিও দিয়েছিলেন। তার পরে আমি অবশেষে এটা লিখলাম। এবং যখন লিখলাম, তখন উনি খুব খুশি হয়েছেন বলে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন যে, দেখুন, আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে এটা বেশি কাজে লাগবে।

আ. ই.: ...সহজ হয়েছে।

ম. দে.: বদরুদ্দীন উমর সাহেব সব দিক দিয়েই Exception আর তো আমি দেখিনি। কাজেই বলার কিছু নেই। কাজেই উনি এতে আসেন না।

ব. উ.: যাক, অন্য কথা বলি আপনি যা বলছিলেন সেটা বলুন।

আ. ই.: যাক, যে প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর এসেছিলেন ভাষা প্রসঙ্গে, তাই না, মানে উপন্যাসের ভাষা এবং আমি বলছিলাম যে শুধু উপন্যাস নয়, প্রবন্ধের ভাষাতেও তা আসতে পারে।

ম. দে.: না, আমি বলছি প্রবন্ধের ভাষা তবু যাঁরা পড়ছেন, সহজ করে লেখা যেটা, সহজ মানুষের কাছে পৌছাব সাধারণ পাঠকের কাছে, ওঁর অন্যান্য লেখা যেগুলো আছে, সেগুলো যার Commitment-এর Sense আছে যে শ্রেণিসংগ্রামটা বোঝে, তার সেটাই যে সব কিছুর মূলে ইত্যাদি যারা বোঝে, তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব। আমি কিন্তু ঐ ধরনের প্রবন্ধের কথা তা-ও বুঝতে পারি। কিন্তু যখন সেটা গল্প-উপন্যাসে আসছে, বাংলা ভাষা আর সাহিত্য প্রবন্ধ পড়লেই তুমি বুঝতে পারবে, কী দরিদ্র হয়ে গেছে, কী রক্তশূন্য, কী নেই কথাটাই সবচাইতে এখানে প্রয়োগ করা যায়। একটা কথাও কেউ বিদেশি কেউ হয় অমুক নয় তমুক, কেউ উল্লেখ না করে কেউ কিছু লিখতে পারে না বাংলাতে। উপন্যাসেও আমি অনেক সময় প্রবন্ধের কাঠিন্য এনেছি। অনেক এনেছি।

আ. ই.: অনেক সময় দরকারও হয়েছে।

ম. দে.: প্রয়োজন হয়েছে, জিনিসটার প্রয়োজন হয়েছে...

আ. ই.: কমল কুমার মজুমদারের আমার মনে হয় দরকার হয়েছে।

ম. দে.: তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি অন্য রকম লিখছিলেন।

আ. ই.: না, এটা তো ঠিকই, উপন্যাসের সমস্যাটা অনেক বেশি আত্মিকধর্মী, যার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙালা ভাষা' প্রবন্ধটা আছে, যেটা আমাদের অহরহ পড়াতে হয়। এই 'বাঙালা ভাষা' প্রবন্ধে মূল সমস্যাটা বলা হয়েছে যে, আমরা কোন ভাষায় লিখব? সাধু রীতি না চলিত রীতি? কী শব্দ ব্যবহার করব? এখন এই ধরনের প্রবন্ধ কিন্তু বিদ্যাসাগরকে লিখতে হয়নি, তাই না? বিদ্যাসাগর তো আমাদের ভাষার অনেক বড় স্থপতি। কিন্তু এ সমস্যাটা Face করতে হলো বঙ্কিমচন্দ্রকে; কারণ তিনি উপন্যাস লিখলেন। তাই না?

ম. দে.: হ্যাঁ, উপন্যাস লিখলেন। তবে 19th Century-র যে গদ্য, যাঁরা পড়েছেন সকলেই স্বীকার করবেন, এই ধরুন রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, অন্য লোকরা, তাঁরা একটা Direct Prose লিখতেন, বোঝা যেত, অনেক সহজও ছিল, Proseটা একেবারেই অন্য রকম; কেননা তাঁদের একটা রুট ছিল গ্রামে। (ব. উ.: দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র–এতটা সুন্দর...) হ্যাঁ, অসামান্য, Infact সেদিক থেকে আপনি তখনকার বাংলার স্টিফনেস অস্বীকার করে, মহারাজা প্রতাপাদিত্য জীবনচরিত, কৃষ্ণচন্দ্র রায় জীবনচরিত–এগুলো যদি পড়েন তখনকার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বার করেছিল। Highly Interesting, Highly Interesting. এমনকি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য যে উপন্যাস লিখেছিলেন, এটা দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ, তা-ও পড়লে অনেক দূর এগোয়। কিন্তু সমস্যাটা আরো পরে এলো, যখন যাদের নিয়ে যা যা লেখা হচ্ছে, বাংলা সাহিত্য থেকে একটা বিরাট Living Language ব্রাত্য হয়ে গেল। Living Language ব্রাত্য হয়ে যাওয়ার পরে শহরেরও একটা Living Language আছে। আর সম্প্রতি আমি 'রামানুজের' অনুবাদ করেছি, তাতে বোঝা যাচ্ছে, গল্পকে বলতে হবে। কারণ গল্পরা হিংস্র। সে জন্য Folk Tale এ প্রসঙ্গে বলেছে, এক গৌড় জমিদার, সে চারটে গল্প জানত, সে একটাও বলতে রাজি না। তার চাকরের খুব ইচ্ছে সে কিছু জানে না, রাত্রে গল্প শুনবে। মুনিব যাচ্ছে জামাইবাড়ি, ও তার সঙ্গে একসাথেই যাচ্ছে যে ও গল্পটা বলবে। মাঝখানে এক জায়গায় আশ্রয় নিল, খাইয়ে-দাইয়ে মনিব যখন শুলো, বলল, গল্প বলো। সে বলল না, ঘুমিয়ে গেল। চাকরটা মনের দুঃখে জেগে একা। তখন চারটে গল্পই তার পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে বলছে, আমাদের যদি বলা না হয়, আমরা তাহলে এই বুড়োর নাতি তার নাতি তার নাতি আমরা পরের দিকে পৌছব কী করে? আবার একজন বলছে, 'তা আমাদের তো তখন চেহারা, বেশভূষাও বদলে যাবে!' বলল, 'যাক। But we must be told thus we live. ঠিক আছে, ও যখন যাবে, ওকে আমি এইভাবে মারব।' দ্বিতীয় গল্প বলছে, এইভাবে মারব, তৃতীয় গল্প তা-ই বলছে, চতুর্থ গল্প তা-ই বলছে। ভৃত্যটি সব শুনে এর মনিবকে চারটে বিপদ থেকেই বাঁচাল। বাঁচাবার ফলে ও একটা পাথর হয়ে গেল। তখন মনিবের যে কন্যা, সে পাথরের কাছে বসে শোনে, তার খুব দুঃখ হয়েছে। আমার বাড়িতে এসেছিল, তার তো এই হয়ে গেল। মনিবের কিছু হয়নি, মনিব ফিরে গিয়ে আরেকটা চাকর রাখল। তখন শুনছে, গল্পরা বলছে, 'এ তো আমরা একেবারে হেরে গেলাম। সেই ছেলেটা সবই শুনেছিল, সবই জানত, একে না বাঁচালে তো আর উপায় নেই।' তো কী করে বাঁচাবে। বলল, যদি মনিবের মেয়ে তার শিশুপুত্রটিকে এই পাথরে আছড়ে মারে, বাচ্চাটা মরবে না, বেঁচে যেতেও পারে, তাহলে ও বেঁচে উঠবে। ও তা-ই করল। বাচ্চাটা কিন্তু আর বাঁচল না। এই লোকটি জীবিত হলো। জীবিত হয়েও ও গিয়ে দেখে, মনিবের বাড়িতে কোনো ঠাঁই নেই। ও তখন মনিবের বাড়ির সামনেই বিরাট একটা মাঠে সবাইকে ডেকে এই গল্পগুলো সব বলতে লাগল। এবং বলল, তোমরা যত লোক জানো এই গল্পগুলো ছড়াতে থাকো। কেননা গল্পে আমি দেখেছি তাদের চেহারা, তারা ভীষণ হিংস্র, তারা ভীষণ সশস্ত্র, তারা ভীষণ, কী বলব, ভীষণ জেদ আছে ওদের, তারা ক্ষুব্ধ, এই করতে করতে করতে ঐ গল্প ছড়াল। মানে ওটাকে উনি টেনে এনেছেন গ্রাফিতি পর্যন্ত। শহরের দেয়ালে যে গ্রাফিতি...that also oral tradition বা কোনো কিছু এই পর্যন্ত। রাস্তাঘাটে, সার্কাস, ম্যাজিক, জাদুকর জাদু দেখায়, কিছু করে না করে, সাপুড়ে সাপ দেখায়, তাদের কথা–এ সবগুলোই Tradition-এর ধারাবাহিকতা। খুব ভালো বই। খুব Interesting বই। অনেক ভালো গল্প আছে এবং এতে দেখা যায়, Actually what was India। এক ভাই। এক রাজার ছেলে, তার দুই বোন। যেমন হয় রাজার ছেলে। বোনরা অন্দরমহলে থাকে ও দেখেনি। ও নদীর জলে চান করতে গিয়ে দেখল সোনার চুল, রুপার চুল। সোনার চুল আর রুপার চুল যে মেয়ের, তাকে বিয়ে করবে। সব মেয়েকে প্যারেড করানো হলো, সেই মেয়ে নেই। তখন দেখে নিজেদেরই প্রাসাদ অলিন্দে বসে দুটো ও রকম

মেয়ে সে দেখছে। তখন বলে, আমি ওদের বিয়ে করব। ওর মা বলে, সর্বনাশ কথা, ওরা তো তোমার বোন। রাজার ছেলে জীবনে তো বোনদের দেখেনি। এইখানেই বিয়ে করতে চায়। যখন বোনদের বিয়ে করবে ঠিক হলো, বাবা-মা শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। ছেলে তো...। ওরা তখন পুকুরপাড়ে গিয়ে একটা গাছে উঠে বসল। তখন বাবা এসে বলছে, নেমে এসো, বিয়ের লগ্ন হয়ে গেছে। ওরা বলল, এত দিন বাবা বলেছি, এখন কি শ্বশুর বলব? মা বলছে, নেমে এসো, এখন বিয়ের লগ্ন হয়ে গেছে। এত দিন মা বলেছি, এখন কি শাশুড়ি বলব? দাদা যখন এসে বলেছে তখন বলছে, 'তুমি কাছে এসো না, কাছে এসো না। এত দিন দাদা বলেছি, এখন কি স্বামী বলব?' সেই গাছটা অনেক দূর উঠে যায়, The tree saved them–এ রকম। এই ধরনের ব্যাপার, যা অনেক ছিল, এ সমস্ত জিনিসই এই ফোক টেলসের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। তো, সমাজকে বারবার বিশ্লেষণ করা, আর গল্পগুলো যে ভাষায় বলা, সেগুলো অতি সহজ, Local Language-এর ব্যবহার করা। খুবই সুন্দর।

আ. ই.: না, আমাদের এই যে যেটাকে আপনি Oral tradition বলেন আর কি, 'ফোক', সেটা কিন্তু অন্তত কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত হয়নি, কবিতায় কিছু কিছু হয়েছে, গানে তো...আর যেটা মুশকিল হয়েছে কি, যখন আমরা 'ফোক' বলি, তখন আমরা গানে সরাসরি ফোকটা শুনি। মানে কোনো লোকসংগীত ইত্যাদি শুনি, সেটা তো খুব দরকার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তো এটা দরকার, সেটাকে আধুনিক কবিতায় ব্যবহার করা। যেমন ধরেন, আপনি গল্প লিখছেন, সেখানে Oral traditon-এর যে গল্পগুলো আপনি বললেন, এ রকম গল্প আমাদের দেশে, বাংলাদেশেও প্রচুর ছড়িয়ে আছে। আমি নিজে দেখেছি, হাজার হাজার দেখেছি, প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে আছে, একেকটা দ্বীপে ছড়িয়ে আছে। এইগুলো একেবারেই ব্যবহার করা হয় না, তার কারণ যেটা আমার মনে হয়, 19th Century যে so called sophistication, তাই না? (ম. দে.: না, সেটা করা হয়নি।) সেটাই আমাদের জনমানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

ম. দে.: না, সেটা করা হয়নি। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখন তো Oral tradition সম্পর্কে আমি বহুকাল আগে যখন, 'ঝাঁসির রানী' আমার প্রথম বই, তখন যে ওদের কাছ থেকে, মাঠে বসে শীত পোহাতে পোহাতে পাথর মিটঠিছে ফৌজ বানাইয়ে কাঠ সে কাটোয়া, পাহাড় উঠাকে ঘোড়া বানাইয়ি চলি গোয়া গোয়া। রানির কথা বলছে। কিছুই যখন ছিল না, তার পাথর থেকেই...কাঠ থেকে তলোয়ার-কাঠ তুলে নিল, ঘোড়া হয়ে গেল, ওপর দিয়ে চলে গেল। সেদিন থেকে আমি ওটা প্রচুর ব্যবহার করেছিলাম ওই বইয়ে। প্রচুর Oral Tradition সংগ্রহ করেছিলাম। এবং সেটা যে ইতিহাসের একটা মূল আকর, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, লোকে যে ফোকের মধ্যেই, এই লোকশ্রুতির মধ্যেই যে টিকিয়ে রাখে। এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও বলেছিলাম। ঢাকা থেকে বা শিক্ষিত স্তরটা থেকে

অনেক গল্প-কবিতা, অনেক কিছু পাওয়া গেছে। কিন্তু অন্য যারা গ্রাম বাংলাদেশের মানুষ, তারা যারা প্রাণ দিয়েছে, যা করেছে, তাদের কাছেই যাওয়া হয়েছে খুব কম। তাদের কথা লেখা হয়েছে খুব কম। তাদের কাছে সংগ্রহ করলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধ, What was মুক্তিযুদ্ধ? তার একটা সাংঘাতিক ইয়ে পাওয়া যাবে। সবই তো ফোক Tradition.

ব. উ.: এখানে যেমন ধরুন যে হোমার, ইলিয়ড, এটা তো আর কেউ বসে, যে version আমরা পাই, বসে লেখেনি তো। শত শত বছরের আরো বেশি (ম. দে.: রামায়ণ, মহাভারত) সময়ের Oral Tradition। এখনকার দিনের Oral Tradition Problem হচ্ছে যে, এই Traditionটা তো ভেঙেও যাচ্ছে। যেমন ধরুন, ওটা মুখে মুখে শত শত বছর ধরে চলে আসছে। এখন কিন্তু সেটা খুব কমই পাওয়া যাবে। নানা রকম উপদ্রবের কারণে। রেডিও বলেন, টেলিভিশন বলেন, সিনেমা বলেন (আ. ই.: গ্রামের যে উন্নয়ন তার) এইটার ফলে, যাত্রা ধ্বংস হয়ে গেছে, সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে; তার ফলে এই যে এখানে এটার যে একটা ভাঙন, তার ফলে Oral Tradition তো এইভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ম. দে.: তাহলে এখানে হয়েছে আমি জানি না, আমি কিন্তু বহুদিন মুর্শিদাবাদের আলতাপের গানে বড় জলপ্লাবন, তারপর স্বাধীনতার আন্দোলন, মুর্শিদাবাদের একটা তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল, সেগুলো সমস্তই আমরা আলতাপের গানে শুনেছি। ঐভাবেই ওটা বেঁচে থেকেছে। আর পুরুলিয়া জেলা, যেখানে আমি কাজ করি, পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্রতম জেলা, খুব Untouched.

আমাদের ব্রতকথা, লোককথা–সবই Oral Tradition, রূপকথাও তা-ই। কিন্তু পুরুলিয়া জেলাতে আমি এ রকম প্রচুর Untouched অনাবিষ্কৃত খনির খোঁজ পেয়েছি। অনেকগুলো তুলে ধরেছি, সংগ্রহ করেছি, বর্তিকার সংখ্যার পর সংখ্যা পড়লে দেখা যাবে যে কী পরিমাণ Oral Tradition লিপিবদ্ধ করা আছে। কাজেই এটা ভীষণ প্রয়োজন। আমরা Oral Tradition-কে বাদ দিয়েছি, আমরা Living Language-কে বাদ দিয়েছি; কাজেই সাহিত্যে সংকটটা এক দিক থেকে আসেনি, সাহিত্যের সংকট নানা দিক থেকেই আসছে।

আ. ই.: না, আরেকটা ব্যাপার, যেটা উমর সাহেব বলছেন Oral Traditon আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। (ব. উ.: যেটা আপনি আপনার 'খোয়াবনামা'য় তো খানিকটা ব্যবহার করেছেন।) না, আপনি যেটা বলেছেন, এটাও আবার ঠিক যে, এটা নষ্টও হয়ে যাচ্ছে, তো সে জন্য আমার মনে হয় লেখকদের দায়িত্ব আরো বেশি...(ম. দে.: এখনই সংগ্রহ করা...) শুধু সংগ্রহ নয় দিদি, আমার মনে হয় যে ব্যবহার করা। (ম. দে.: সংগ্রহ করো, ব্যবহার করো।) সংগ্রহ করা, ব্যবহার করা–তাই না ব্যাপারটা? আমি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি খানিকটা। তো আমার মনে হয়, এভাবেই এটা টিকে থাক। যদি মনে করি যে, সব শেষ হয়ে যাবে, Oral Tradition তা যদি শেষ হয়েও যায় অন্তত আমাদের লেখায় জিনিসটা কোনো না কোনোভাবে টিকে থাকতে পারে।

ম. দে.: সেইভাবে থাকতে পারে সেইটে মনে করেই হয়তো...

আ. ই.: তাহলে আমার মনে হয় বেশি খরারহম থাকবে।

ম. দে.: আমি আমার লেখায় Oral Tradition প্রচুর ব্যবহার করি, করেছি, চোট্টি মুণ্ডাতে তো আছেই, প্রচুর আছে, সবই তো জানেন আপনারা...কি হলো রে জান, পলাশীর ময়দানে, মা বাপ হারালো, পরাণ। তেলেঙ্গা বিবিরা এই করছে সেই করছে–এই সবগুলো গানে কিছু টিকে আছে, সবটা টিকে থাকতে পারে না। আরেকটা হচ্ছে, বৃদ্ধরা তো মরে যাচ্ছে। কে ধরে রাখবে? মরে যাচ্ছে, স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।...রেণু রেণু হয়ে যাচ্ছে, ধুলো হয়ে যাচ্ছে, বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, বিরসার একটা গানে যা আছে, এখন সেই বাতাসের উড়ন্ত ধূলিকণা তুলে এনে একটা দেশ কী করে রচনা করবে?

আ. ই.: এইটা একটা Problem, সাংঘাতিক, যেখানেই যাই...

ম. দে.: এটা কিন্তু সাহিত্যের জীবনের অনেক বড় বড় সংকট, এর থেকে উদ্ভূত একদিক থেকে হয়েছে হবে, কাজেই এখনো যদি না পারা যায়, সচেতন বা মনস্ক হয়ে আমরা এগুলোকে না করি তাহলে খারাপ।

আ. ই.: আপনার শবরদের সঙ্গে যে কাজ করার অভিজ্ঞতা, আপনি খুব গল্পের মতো করেই বলুন আর কি কেমন, কারণ আমরা বারবার শুনছি তিনি তো শবরদের সঙ্গে কাজ করেন। উচা উচা পারাবাতে...আমরা চর্যাপদ পড়ার পর আমার মনে হয়েছে, শবররা আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু শবরদের সঙ্গে তো দিদি কাজ করছেন।

ম. দে.: না না, শবর মানে তো ব্যাধ, কাজেই সারা ভারতবর্ষেরই উপকূল থেকে আরম্ভ করে এখানে পর্যন্ত তাদের নাম পাল্টে, এখানে তারা মাইগ্র্যান্ট হয়ে এসেছে, আমি জানি না, পার্বত্যদের মধ্যেও যেসব উপজাতি আছে। শবর বা Hunter–এই ধরনের ইয়ে থাকতে পারে।

আ. ই.: আপনি যে শবরদের সাথে কাজ করছেন?

ম. দে.: এরাও শবর, লোধারাও শবর...

আ. ই.: এরা কী শবর বলছিলেন?

ম. দে.: এরা হলো খেড়িয়া শবর। খেড়িয়া নামে তিনটে গ্রুপ আছে–দুধকিয়া, ঢোলকিয়া, পাহাড়িয়া। এরা পাহাড়িয়া শবর। সব পাহাড়কেই এরা পূজা করে। সব পাহাড়ই এদের কাছে পূজিত। কাজেই এরা পাহাড়িয়া শবর। এদের মধ্যে আমি যখন যাই, যেটা আমাকে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে, এদের মধ্যে বার্টার সিস্টেম চলে, (আ. ই.: এখনো?) এটা দেখে আমি, আমার Tremendous একটা আঘাত লেগেছিল। আমি বললাম, এই যে চুকা গাছের ফল, এটা খাস। ঐ লাল, ওগুলো খাস। আর পাতাটা তো ওরা সবই শাকের সাথে খেয়ে নেয়। তো ডাঁটাগুলো শুকোলে জ্বালানি করে। ফলে বীজগুলোর কী হয়? একজন মাওতো ছিল Other caste, সে বলল, 'এগুলো আমরা কুচিয়ে ফেটে ভাজা করে খাই।' ও ভীষণ অদ্ভুত সুন্দর হেসে শিশুকে বোঝানোর মতো বলল, 'মা, এগুলোকে আমরা পুড়ে তেল করি।' তেল তৈরি করে ওরা সেটাকে কুচা বাজারে নিয়ে যায়, ১১ মাইল দূরে পাহাড়ি গ্রামে। ঐ তেলটা দেয় যারা কবিরাজি ওষুধ বাকল কিনতে আসে তাদের কাছে, পাশেই মুদির দোকান এবং সেই কবিরাজি ওষুধ বাকল যে কেনে, সেও খুব বুদ্ধিমান। সেই নুন, কেরোসিন, নিত্যদ্রব্য নিয়ে রেখে দেয়। ওরা তার বদলে নুন আর কেরোসিন তেল আনে। ঐ বার্টার সিস্টেম।

আ. ই.: এখনো চলছে?

ম. দে.: এখনো চলছে। শবর জাতি এত দূরে দূরে থাকে। ওদের মধ্যে বার্টার System widely practiced। এটা তো তেল তৈরি করে, তা ছাড়াও ওরা এই ওষুধ বাকল লতাপাতা যা পেল এত জঙ্গলকাটা করার পর, তা ওরাই পরে নিয়ে আসে। মধু আনে। শিমুল তুলো কুড়িয়ে আনে। গাছের বীজ আনে। আরো অনেক কিছু আনে এ রকম। তো সেগুলোর বদলে ওরা ওদের কাছে যা প্রয়োজনীয় জিনিস, সেগুলো নিয়ে নেয়। পয়সার Transaction শবর ৫০ বছর আগেও করেনি। ২৫ বছর আগেও তেমন করেনি। এটার বদলে ওটা এসব করছে।

আ. ই.: পশ্চিম বাংলারই একটা অংশ না?

ম. দে.: হ্যাঁ, পুরুলিয়ার জেলাতে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে গরিব জেলা পুরুলিয়া। আর পুরুলিয়ার সবচাইতে গরিব হচ্ছে শবর।

ব. উ.: ওখানে যারা মজুর, তাদেরকে কিভাবে তাদের মজুরি দেওয়া হয়?

ম. দে.: মজুরের দামটা Govt.-এর যেটা প্রতিশ্রুত মজুরি সেটা এখন...পুরুলিয়াতে বছরে একবারই ধান হয়। তিন মাসে। আর সকলে যে বড় জমির মালিকানা...পশ্চিমবঙ্গে তো বড় জোত সব ভেঙে গেছে।

ব. উ.: তার মানে এগুলো সব এক ফসলের জায়গা?

ম. দে.: এক ফসলের জায়গা, একদম Monocrop, কিন্তু Monocrop এলাকাকে যে Bycrop-Tricrop করা যায় Irrigationless Cultivation করে, এটা একমাত্র শবররাই Experiment করে দেখাল। যাদের জমি আছে, তাদের দিয়ে আমি সে কাজ করাতে পারি না। কেননা ওদের যে দৃঢ় সংস্কার। ওরা বলল, না, আপনি যা বলছেন তা হয় চীনাবাদাম চাষ হয় শরতের দিনে, শীতের দিনে কিন্তু সেটা করলে নাকি পরের বছর ধান হবে না। এসব সংস্কারে ভদ্রসমাজই পড়ল। আর এরা এসব Inherit করে না। বা যেসব Tribe খুব Mainstream-এর কাছ থেকে, তাদের অনেক কিছু নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে বসে আছে, এরা তার মধ্যেও নেই। এরা তো অন্য Tribe-এর থেকেও দূরে। যে জন্য বললাম, ওরা যখন ওদের দিয়ে মাছ চাষ করবে, তার জন্য বাঁধ কাটে, ওখানে পুকুরকে বাঁধ বলে, বড় বাঁধ কাটা হলো, মাছের পোনা চাষ করার ছোট চারটি করা হলো ইত্যাদি। Pump Irrigation অনেক জায়গাতেই বসানো হয়েছে এবং Pump Irrigation যেটা, সেটাকে operate করার জন্য শবর ছেলেদেরকেই আমরা রাঁচী থেকে Training দিয়ে এনেছি। তারাই এগুলো অপারেট করে। Soil Testing ওরা করে। Water Conservation ওরা করে। জলের লেয়ার কোথায় পাওয়া যাবে? ওরা করে। যা যা হয়েছে, ওরা নিজেরাই সেটা অপারেট করতে পারে। যা হোক, তখন শোনা গেল যে প্রথম বর্ষায় যে মাছ আসে সেই মাছ ধরে বাঁচানো পাপ। এটা জেলারই বিরোধী। ওখানেও বাঁকুড়াতেও। কারণ হচ্ছে, সে মাছ বাঁচে না, ফলে পরবর্তী মাছগুলোও বাঁচে না। শবররা সহাস্য মুখে গিয়ে সেই মাছই ধরল। প্রথম মাছ ধরল নদী থেকে। ধড়াৎ ধড়াৎ ধরল, এনে ধরে পুকুরে ফেলল। এবং সেই মাছ বাঁচল। তার পোনা বড় হলো। (আ. ই.: সংস্কারটা ভেঙে গেল?) এবং Quietly. আমি যে বারবার বলি হাতে-কলমে কাজ, হাতে-কলমে কাজ করার ফলে একটা সংস্কার ভাঙল। একটা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হলো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকদূর কাজ করা গেল। অনেকটা মুক্ত হয়ে গেল। অনেকগুলো শিকল খুলে গেল। এখন এই রকমই ওরা বারবার করে যেতে লাগল। যখন পরিপূর্ণ সূর্যগ্রহণ হচ্ছিল। সূর্যকে ওরা বলে বেড়া। এখন বেড়া ডোবা বা বেড়া নিভান–এটা তো কত Generation পরে আবার দেখা যাবে। কাজেই ওরা সবাই চাল-ডাল-হাঁড়ি নিয়ে মাঠে চলে গিয়েছিল। ওদের গ্রাম দেবতা মানে গড়াম, গাছ। একটা গাছকে ওরা গ্রাম দেবতা করে, তাকে সাধারণত গড়াম বলে। সে সাঁওতালরা বলে, মুণ্ডারা বলে–সবাই বলে। শালগাছ সব জায়গায় পাওয়া যায় না, ওরা অন্যান্য গাছকেও গড়াম করছে। তো, সেখানে ওরা তা দেখল। দেখার পর ওখানে খুব ভালো করে খিচুড়ি-টিচুড়ি রান্না করল, খেল, সব পরিষ্কার করে মার্জনা করে দিল জায়গাটা। আর সূর্য ছিল না, আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল, তার স্মারকস্বরূপ কালো পাথর আগেই জোগাড় করে রেখেছিল। কালো পাথর নিয়ে গড়ামের ওখানে ভক্তিসহকারে স্থাপন করল। তো, এইটা একটা Indication রেখে দিল যে, আমরা একটা বেড়া ডোবা দেখেছিলাম, পরে আমাদের নাতি-নাতনিরা বুঝতে পারবে। কাজেই সূর্যগ্রহণ কী, দেখলে কী হয়, খোলা চোখে দেখলে কী হয় না হয়–ওরা Quietly কাজটা করে চলে গেল।

(চলবে)